সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সত্যেন সেনের রাজনৈতিক উপন্যাস

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.4
Pages	81-114
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সত্যেন সেনের রাজনৈতিক উপন্যাস

রফিকউল্লাহ খান

জীবনবোধের কেন্দ্রস্থ আবেগ থেকেই সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) রাজনীতিমনস্ক শিল্পীপুরুষ। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের আন্তর-প্রেরণাই ছিলো তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের শক্তি-উৎস। কোনো সৃষ্টিশীল মানস যখন একটি জাতির রাজনৈতিক কর্মধারার চলমানতার সাথে বিকশিত ও রূপান্তরিত হতে থাকে----এবং সময় সমাজ ও সভ্যতার দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের সুগভীর অনুধ্যানের সাথে তত্ত্ব-জ্ঞান ও সামূহিক জীবনচৈতন্যের সমন্বয়সাধনে সক্ষম হয়---তখনই রাজনীতি হয়ে ওঠে শিল্পের প্রাণময় উপাদান। সত্যেন সেনের উপন্যাস-বিচারের ক্ষেত্রে এ-সত্যের প্রাসঙ্গিকতা অপ্রতিহত। কেননা, তাঁর রাজ-নৈতিক কর্মীসত্তা এবং শিল্পীসত্তা অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত।[১] সত্যেন সেনের জীবননীতি ও শিল্পনীতির মূলে যে-বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়, সেখানে ক্রিস্টোফার কডওয়েল কথিত সত্যই যেন প্রতিফলিত : ‘উপন্যাসের এবং বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য এমন কি প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মূর্ত অভিজ্ঞতার পরিপক্কতার প্রয়োজন।’[২] সত্যেন সেনের সাহিত্য-সাধনার উৎসমূলে ক্রিয়াশীল সচেতন ব্যক্তিক অভীপ্সার সাথে সামূহিক অস্তিত্বের জটিল দ্বন্দ্ব-সমন্বয়। রাজনৈতিক অভিজ্ঞান তাঁর উপন্যাসসমূহে একটা দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ মীমাংসায় উত্তরণের প্রাণবিন্দু। তাঁর উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রপুঞ্জ একারণেই যেমন জৈবনিক অনিবার্যতাসূত্রে দ্বন্দ্বরক্তিম, তেমনি মীমাংসাপ্রবণ। তত্ত্বাবেগ ও জীবনাবেগের এই সমন্বয়বোধ কেবল তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ বা ইতিহাস—আশ্রিত উপ-ন্যাসেও সুস্পষ্ট। কিন্তু সার্থক শিল্পনির্মিতির প্রশ্নে তত্ত্বজ্ঞান ও জীবনা-বেগের সাথে শিল্পাবেগের যে অন্তর্গূঢ় সংযোগসাধন অনিবার্য শর্ত, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই যেন সে-প্রশ্নে সংশয়সূচক। তবে সত্যেন সেনের শিল্পবিচ্যুতির কার্যকারণ তাঁর জীবনবোধের কেন্দ্রস্থ প্রেরণা-মূলেই

সন্ধান করতে হয়। সাহিত্যসাধনাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত করে দেখার দায়িত্বময় অভীপ্সার মধ্যেই তাঁর সৃষ্টিশীলতার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিহিত। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সাহিত্যযাত্রায় তিনি যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন, বাঙালি জাতির ইতিবাচক রাজনৈতিক অন্বেষা, তার সংগ্রাম, রক্তপাত ও উত্তরণের জটিল গতি-প্রক্রিয়ার সাথে তা অভিন্ন।

জীবনের অনুষঙ্গেই শিল্পের প্রত্যয় ও প্রকরণ নবতর তাৎপর্য লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগ ও তার পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাধারা উপমহাদেশে বিশেষ করে পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশে এক জটিল চারিত্রবৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ হয়ে ওঠে। জনজীবনের জটিল চরিত্ররূপ সৃষ্টিশীল মানসকে করে তোলে দ্বন্দ্বমুখর। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিবাচক পরিণতি বাঙালির সৃষ্টিশীল আবেগকে করেছিলো তরঙ্গস্পন্দিত ও জীবনমূলস্পর্শী। জাতির সৃষ্টিশীলতার সেই জীবন্ময় অভিযাত্রা গতিচ্যুত হলো ১৯৫৮ সালে, আয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে। সামরিক শাসনের হিংস্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত জনজীবন-অন্তর্গত শিল্পীমানস রাজনৈতিক প্রতিবাদকে শিল্পের অবলম্বন করার পরিবর্তে আত্মবিবরকামিতা এবং পলায়নমুখী মনোবৃত্তিকেই জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে যথার্থ প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজ, সময় ও জীবনের এই নেতিবাচক অধোগতির কালেই সত্যেন সেন রাজনীতিকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন। এবং সে-রাজনীতি জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তঃশীলা আকাঙ্ক্ষা ও কর্মধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, মার্কসীয় চেতনালব্ধ প্রগতিশীল আদর্শের অগ্নিময় উত্তরাধিকারকে ধারণ করে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরণের দিগ্‌দর্শন হিসেবে বিন্যস্ত হলো। 'যে ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক প্রয়োজনের তাগিদে উপমহাদেশে গত শতাব্দী থেকেই এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও স্তর এবং ভাষাভাষী জাতি শরিক হয়েছিল সমস্ত পাষাণচাপা ঠেলে সরিয়ে, সেই প্রয়োজন আবার স্বাভাবিকভাবেই মাথা তুললো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো ৫২ সালের বাংল ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের

জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম একটি সমাজতান্ত্রিক গণবৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামের রূপও নিতে শুরু করলো। ধর্মনিরপেক্ষতার তাগিদও এতে সন্নিবেশিত হলো।'[৩] জাতীয় চৈতন্যের এই অগ্নিমুখী আকাঙ্ক্ষাকে উপন্যাসের শিল্প-রূপে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫), জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) এবং জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' (১৯৬৯) নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। '৫২ সালের গণ-অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি হিসেবে শুধু ৪৭ থেকে ৫১ নয়, এর আগেও যে একটা অন্তঃশীল যুগ গড়ে উঠেছিল, তারই ঘটনা পরিক্রমার ভিত্তিতে রচিত 'সংশপ্তক'। ...১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে নববিদ্রোহের সূচনাকে নিয়ে লেখা জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন'। আর ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরী করলো যে ৬৮-৬৯ সামরিক স্বৈরাচারী বিরোধী গণবিপ্লবাত্মক অভ্যুদয়, তাকে নিয়ে লেখা জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী।'[৪] শৈল্পিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সত্যেন সেনের স্রষ্টাচৈতন্যে শহীদুল্লা কায়সারের প্রভাব অনেকাংশে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কেননা, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের কারাগারে সত্যেন সেনের মতো শহীদুল্লা কায়সারও অন্তরীণ ছিলেন। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' এবং সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ'[৫] ও 'অভিশপ্ত নগরী'র[৬] রচনাকাল এবং রচনাস্থান অভিন্ন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।[৭] সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শের ঐক্য-সূত্রে উভয়ের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের উৎসমূলে অভিন্ন প্রেরণাই ক্রিয়াশীল ছিলো। কিন্তু সত্যেন সেনের রাজনৈতিক জীবনপরিক্রমার সূচনা ১৯৩০ সাল হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি ছিলো ব্যাপক ও বিস্তৃত। কংগ্রেস, 'স্বদেশী' সন্ত্রাসবাদী-রাজনীতিচর্চা এবং পরিণামে কমিউনিজমে দীক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত স্বরূপসত্যকে অভিজ্ঞানমণ্ডিত দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকনে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।[৮] তাঁর নির্মম বস্তুনিষ্ঠা ও সত্যসন্ধ জীবনদৃষ্টির মূলে অভিজ্ঞতার এই বিচিত্রমুখী আলোড়ন-উত্তাপ নিগূঢ় ভূমিকা পালন করেছে।

দুই

রাজনীতি সত্যেন সেনের জীবন ও শিল্পবোধের কেন্দ্রীয় প্রেরণা হলেও তাঁর পনেরোটি উপন্যাসের[৯] মধ্যে মাত্র তিনটির মুখ্য উপাদান রাজনীতি।

কিন্তু যে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অঙ্গীকার তাঁর জীবনচেতনার স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক প্রান্ত, তা অন্তঃশীলা শক্তিবেগে প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেরই মর্মমূলে গতি ও স্পন্দন সৃষ্টি করেছে। এর কারণ 'উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে জনগণের অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানে যাঁরা নিরন্তর বর্তমান শতকের প্রায় গোড়া থেকে আশির দশক পর্যন্ত একটার পর একটা ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতী ও উদ্যোগী থেকেছেন, সত্যেন সেন সেই কর্মীদেরই একজন।'[১০] রাজনৈতিক কর্মীসত্তার দায়িত্বজ্ঞান থেকে সাহিত্যসাধনাকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করার ফলেই তাঁর উপন্যাসে জীবন ও রাজনীতি তুল্যমূল্য হয়ে প্রতিবিম্বিত। সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারহীনতা যে মানবীয় সংবেদনার বহুবর্ণিল প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, ব্যক্তিক এবং সমষ্টিগত জীবনাভিজ্ঞতা থেকে তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। যে 'তত্ত্বের যন্ত্রণা আর ব্যক্তির টেনশন, তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তির উদ্বেগ'[১১]—এর সমন্বয় রাজনৈতিক উপন্যাসের শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সত্যেন সেনের রাজনীতি-আশ্রয়ী উপন্যাসসমূহে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি বিদ্যমান। অবশ্য এই দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা এবং উদ্বেগের উৎসমূলে সামূহিক জীবনচৈতন্যের গভীর অঙ্গীকারের প্রশ্ন জড়িত। একটা গভীর তত্ত্ববোধ সত্যেন সেনের শিল্পপ্রেরণার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল থাকলেও তাঁর উপন্যাস তত্ত্বনির্ভর হয়ে ওঠে না কখনো। তত্ত্বের দর্পণে জীবনকে অবলোকন করার পরিবর্তে জীবনের স্পন্দন-শিহরণে তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন তিনি। এ-ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্প-সাফল্য অর্জনে সক্ষম না হলেও জৈবনিক অর্থে তাঁর এই তত্ত্ববোধের ভূমিকা নিগূঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ। 'রাজনৈতিক উপন্যাসে তত্ত্বের বাড়াবাড়ি ঘটলে তা তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয় বটে—কিন্তু তত্ত্বকে স্বরূপে উপস্থিত না করলে উপন্যাসের ব্যক্তিকথাও অস্পষ্ট হয়ে যায়।'[১২] তত্ত্বের এই আতিশয্যকে সত্যেন সেন অতিক্রম করে গেছেন সুগভীর জীবননিষ্ঠায়, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিবেগ ও তার দ্বন্দ্বময় স্বরূপ অনুধ্যানের ঐকান্তিকতায়।

সত্যেন সেনের রাজনৈতিক উপন্যাসের সংখ্যা তিন। এক. "সাত নম্বর ওয়ার্ড",[১৩] দুই. "উত্তরণ,"[১৪] তিন. "মা"[১৫]। আপাতদৃষ্টিতে "সাত নম্বর ওয়ার্ড" ব্যাপক কোনো রাজনৈতিক আলোড়নের পটভূমিতে রচিত

উপন্যাস নয়। কিন্তু যে-গণতান্ত্রিক অধিকারচেতনা রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এ-উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জের মূলে তা-ই ক্রিয়াশীল। পক্ষান্তরে, "উত্তরণ"-এর মহাকাব্যিক অবয়বে বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তরকালের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্মরূপ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি, "মা" উপন্যাসের তত্ত্ব এবং আদর্শগত সংস্কারের দ্বন্দ্ব-উদ্ভূত পরিস্থিতির মীমাংসাপ্রবণ পরিণতি সন্ধানের প্রয়াস-ই মুখ্য। "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" যদি হয় সত্যেন সেনের 'রাজনৈতিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা',[১৬] তবে উল্লিখিত তিনটি উপন্যাস তাঁর মীমাংসিত রাজনৈতিক অভীপ্সা ও অভিজ্ঞানের শিল্পরূপ।

তিন

সত্যেন সেনের "সাত নম্বর ওয়ার্ড" লেখকের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার ঔপন্যাসিক রূপ। উত্তম পুরুষে বর্ণিত কাহিনীর কথক একজন রাজবন্দী—যাকে কড়া প্রহরার মধ্যে হাসপতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কাহিনী বিন্যাসের দিক থেকে "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ"-এর সাথে এ-গ্রন্থের সঙ্গতি সুস্পষ্ট। কিন্তু "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" উপন্যাসে যেখানে কারান্তরালবর্তী ব্যক্তি-অস্তিত্বের সমাজদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে, "সাত নম্বর ওয়ার্ড"-এ সেখানে হাসপাতালের চিকিৎসাকামী বিচিত্র রোগীদের চরিত্র-অনুধ্যানকে অতিক্রম করে মুখ্য হয়ে উঠেছে অধিকার-সচেতন সেবিকাদের আন্দোলন, সাফল্য ও তার প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ। কাহিনী-উপস্থাপনায় ডায়েরীর স্বভাববৈশিষ্ট্য থাকলেও এ-গ্রন্থকে ঠিক ডায়েরী বলা যায় না। নাটকীয় বিন্যাস, বক্তার নিরাসক্ত দূরত্ব এবং পর্যবেক্ষণ-শক্তির বিস্তৃতি ও গভীরতা গ্রন্থটিকে উপন্যাসের সমধর্মী করে তুলেছে। গ্রন্থের সূচনাংশ নিম্নরূপ :

> পাঁচ নম্বর, পাঁচ নম্বর.... . .
>
> নিজের বেডের উপর বসে সামনের খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। জানালার পরেই ওয়ার্ডের এক দিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত ঢালা লম্বা বারান্দাটা। বারান্দাটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে খোলা আকাশের সংগে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। কিন্তু আমার এই বেডে বসে

> আকাশের ছিটেফোঁটা দেখবারও যো নেই। বারান্দাটার ওপারে একটা কদাকার বিল্ডিং পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের মুখ দেখা দূরে থাক, বাইরের আলো বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখাটাই যেন ওর একমাত্র কাজ। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যেন এক যো-হুকুম প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।[১৭]

একজন রাজবন্দীর দৃষ্টিকোণ থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার এই বর্ণনা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কারান্তরালে অবরুদ্ধ না-হলেও কারাগারের অনুষঙ্গ প্রতিমুহূর্তে তার প্রহরায় নিয়োজিত। এই অবরুদ্ধ বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় পার্শ্ববর্তী বিল্ডিংটাকেও তার মনে হয় 'যো-হুকুম প্রহরীর মত' দণ্ডায়মান। এবং 'ওকে দেখে মনে হয় প্রচণ্ড শক্তিধর। ওর অঙ্গে অঙ্গে কাঠিন্য, রুক্ষতা আর রূঢ়তা। কিন্তু এত শক্তি নিয়েও ওর চলচ্ছক্তি নেই, ওর পা শিকলে বাঁধা। ও সামনের দিকে এগিয়ে চলতে পারে না, তবে গতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দু'বাহু মেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এর মধ্যেই ওর শক্তি, এর মধ্যেই ওর শক্তির সীমা।' একজন বন্দী রাজনৈতিক কর্মীর অনুভব ও উপলব্ধির যথাস্থিত বিন্যাস এর বর্ণনাধর্মিতাকেও তীক্ষ্ণ ও অর্থবহ করে তুলেছে। এভাবেই পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনবাস্তবতা একজন ব্যক্তির জীবনকথায় হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতময়, প্রত্যক্ষগোচর:

> আমি একপাশ ঘেঁষে আছি, আমার বেডের সংগে জানালাটা। জানালাটার পরেই বারান্দা। সেখানে একজন সিপাই এবং একজন আই. বি.'র লোক ২৪ ঘণ্টার জন্য ডিউটি দিচ্ছে। আমার গতিবিধি এবং কার্যকলাপের দিকে সতর্কে দৃষ্টি রাখাটাই এদের কাজ।
>
> এতগুলি রোগীর মধ্যে এইখানেই আমার বৈশিষ্ট্য। আমি কেউকেটা নই, সিপাই সাহেবের খাকী পোশাকের পটভূমিকায় আমি সবার চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি।[১৮]

সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক বিন্যাসের যে-অসঙ্গতি আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চিকিৎসাক্ষেত্রকে করে রাখে শৃঙ্খলবদ্ধ, জীবনবিন্যাসের সেই অসঙ্গত প্রক্রিয়ার অনিবার্যতাসূত্রেই জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ নার্সদের

অধিকারও হয় পদদলিত। বঞ্চিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস ক্রমান্বয়ে অধিকার-চেতনা থেকে আন্দোলনে পরিণত হয়। আর অন্যান্য রোগীদের মধ্যে থেকেও উঠে আসে সমাজমানসের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি : 'কত দিন আর আটকে রাখবে! ছাড়তেই হবে। আপনাদের কথা নিয়ে পাবলিক ক্ষেপে উঠেছে।' একজন রাজবন্দীর আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা ও জীবন-অবলোকনের স্বাতন্ত্র্য এ-ভাবেই উপন্যাস-বিধৃত সাধারণ কাহিনীস্রোতে গভীরতর অভিক্ষেপ সৃষ্টি করেছে।

হাসপাতালের 'স্বাস্থ্যঘটিত' বিষয়াবলী সাধারণভাবে চিকিৎসাপ্রার্থী রোগীদের চর্চা বা ভাবনার অনুষঙ্গ। কিন্তু গোটা সমাজব্যবস্থা যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র-প্রশাসনের নীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন অবস্থা যখন সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ ক'রে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর—তখন হাসপাতালের স্বাস্থ্যচর্চার মধ্যেও অনিবার্যভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয় সামাজিক ক্ষয়রোগ, রাষ্ট্রীয় জীবাণু-বাহিত অসংখ্য ক্ষতিকর উপাদান। "সাত নম্বর ওয়ার্ড" উপন্যাসে সত্যেন সেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে-সত্যকেই উন্মোচন করেছেন। কিন্তু একজন সচেতন ঔপন্যাসিক সমাজ-রাজনীতির জটিল চরিত্ররূপকে শিল্পের অবলম্বন হিসেব গ্রহণ করলেও তাঁর জীবনদৃষ্টিকে হতে হয় সমগ্রতাসন্ধানী। এ-উপন্যাসের কথক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসকে ধারণ করেও এ-কারণে মানবীয় সংবেদনশীলতার বিস্তারে অনন্য। প্রত্যেকটি চরিত্রকে, তাদের যন্ত্রণা ও দীর্ঘশ্বাসের অন্তর্মর্ম উপাদানসমূহকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। উপন্যাসের মূল ঘটনা এবং পরিণতির সাথে সক্রিয় সংযোগ না-থাকলেও তীক্ষ্ণ অনুভববেদ্যতায় কথক রাজবন্দীই হয়ে উঠেছে সবকিছুর অবলোকনবিন্দু। তার মধ্য দিয়েই লেখক উপস্থাপন করেছেন নিজ জীবনবোধের কেন্দ্রস্থ সত্যকে।

জীবন এবং জীবিকার নিশ্চয়তা ও অধিকারবোধ থেকেই মানুষ রাজনীতিসচেতন হয়ে ওঠে। যে-কারণে কর্তৃপক্ষের দমন-পীড়নের মধ্যেও নার্সরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনকারী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেই অত্যাচার-অবিচারকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অগোচরে রাখলে তাদের আন্দোলন যে বিচ্ছিন্ন ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এই বোধ থেকেই সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতে হয় :

পরদিন কাগজটা পেলাম।
ঘণ্টাখানেক বাদে এসে জিজ্ঞাসা করল, পড়েছেন ওটা?
হ্যাঁ, পড়েছি। সত্যি ভীষণ-অত্যাচার তো!

আমার সমবেদনার সুর ওর মনকে স্পর্শ করল। ব্যগ্রভাবে বলে উঠল, এখানে যা লিখেছে তা তো কিছুই নয়। যা সব ঘটনা চলেছে এখানে তা বলবার নয়। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে কোন কথা বলার মত কেউ নেই। এই যে রিপোর্টটা বেরিয়েছে কাগজে, এ কি আপনি বেরিয়েছে! কাগজওয়ালারা কি আমাদের কোন খোঁজ-খবর নেয়? আমাদেরই একজন নিজে এই রিপোর্টটা কাগজের অফিসে পৌঁছে দিয়েছিল।[১৭]

'বাইরের লোকের চোখের আড়ালে' নিঃশব্দে অনুষ্ঠিত ট্রাজেডী দিনাজপুরের পল্লী গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সরলপ্রাণ এক সেবিকার অভিজ্ঞতার উচ্চারণে প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করছে। কথকের অন্তর্দৃষ্টি অতিশ্রমে বিপর্যস্ত তরুণীর জীবনবাস্তবতার উন্মোচনে মানবিক সংবেদনশীলতায় হয়ে ওঠে বেদনার্দ্র, ভারাক্রান্ত: 'যে বয়সে জীবন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মুকুলিত হয়ে ওঠে সেই বয়সে ও ক্লান্তিতে ভেংগে পড়েছে, জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে ওর কাছে।' নারীশ্রমের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্বরূপ রাজনীতিসচেতন ঔপন্যাসিক গভীর মমতায় রূপায়িত করেছেন। এবং সেই বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাসকে শক্তিতে পরিণত করে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দিয়েছেন। যারা সর্বক্ষণ মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ, তাদেরও যে নিজস্ব স্বাস্থ্য আছে, এবং রোগাক্রান্ত হলে আছে বিশ্রামের ও চিকিৎসার প্রয়োজন—হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারেও নির্মম, উদাসীন। আফিয়ার মর্মন্তুদ পরিণতির মধ্য দিয়ে সে-সত্যকেই প্রতিপন্ন করেছেন লেখক। প্রফেসার ড. মালেকের উক্তির মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা তথা প্রশাসনের অসঙ্গত চারিত্ররূপই প্রকাশ পেয়েছে:

—Who is responsible? প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হাসপাতাল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে গভর্নমেন্ট, জনসাধারণ—তুমি, আমি, সবাই দায়ী। কেউ এ দায়িত্ব এড়াতে পারবে না!...

> বলেছিলেন, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয় কিন্তু When we collectively murder, সেটা প্রায়ই প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, তার জন্য কোন দণ্ডেরও বিধান নাই। আমি অনেক দেখেছি। এই যে মেয়েটা মরতে চলেছে, হয়তো এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হয়তো আমরাই মারলাম, কিন্তু সেজন্য সামান্য কৈফিয়ৎটুকু পর্যন্ত দিতে হবে না।[২০]

অত্যাচার-অনাচার-বঞ্চনা এবং শ্রমশোষণের প্রতিবাদে হাসপাতালের নার্সরা সংঘবদ্ধ হয়। কিছুসংখ্যক যুক্তিসঙ্গত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তারা ধর্মঘট করার প্রস্তুতি নেয়----'তারা সবাই মিলে দাবী তুলেছে, একে রোগী হিসবে হাসপাতালে admit করিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। সকাল থেকে দু-পক্ষে এই নিয়ে ঠোকাঠুকি চলছে। অবস্থা crisis-এ এসে দাঁড়িয়েছে। নার্সরা জানিয়ে দিয়েছে, তাদের এই দাবী যদি না মানা হয়, তাহলে তারা Strike করবে।'[২১] একজন নার্স-এর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে জাগ্রত সচেতনতা চরম আন্দোলনে পরিণত হয়। হাসপাতালের বাইরের রাজনৈতিক শক্তির সাথে হাসপাতাল অন্তর্গত সংঘশক্তির আন্তরক্রিয়া একটা সর্বজনীন রূপ নিলে সন্ত্রস্ত কর্তৃপক্ষ নার্সদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

"সাত নম্বর ওয়ার্ড" উপন্যাসে ঔপনিবেশিক সমাজ-কাঠামোর অন্তর্গত প্রশাসনিক অব্যবস্থাকে সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন সত্যেন সেন। নার্সদের দাবী স্বীকৃতি অর্জন করলেও কর্তৃপক্ষের আক্রোশ অসঙ্গতভাবে নিপতিত হয় ওয়ার্ডের চিকিৎসারত রোগী আকমলের ওপর। মারাত্মক রোগী হওয়া সত্ত্বেও তাকে discharge করা হয়। নার্সদের জয়লাভের মূল্য দিতে হয় সচেতন সংবেদনশীল রোগী আকমলকে। সমগ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপান্তর ছাড়া যে নার্সদের বিজয় তাৎক্ষণিক, উপন্যাসের পরিণতিতে সে-সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আত্মজৈবনিক ঘটনার বর্ণনাধর্মী উপস্থাপনা হলেও "সাত নম্বর ওয়ার্ড" উপন্যাসে সত্যেন সেন পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীর ক্ষতকে স্পর্শ করেছেন। নিরাসক্ত শৈল্পিক মানদণ্ডে উপন্যাস হিসেবে এর সার্থকতা হয়তো সংশয়োত্তীর্ণ

নয়, কিন্তু একটা বিশেষ সময়ের অবরুদ্ধ, বিপন্ন, অসঙ্গতিতাড়িত জীবন ও তার প্রতিবিধানকামী জীবনদৃষ্টির গুণেই "সাত নম্বর ওয়ার্ড" উপন্যাসের বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্য।

তিন

ব্যক্তির সামাজিক অস্তিত্ব, তার আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-আবিষ্কারের জটিল প্রক্রিয়াকে সামূহিক জীবনবাস্তবতার পটভূমিতে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে সত্যেন সেনের "উত্তরণ" বাংলা উপন্যাসের ধারায় উজ্জ্বল চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হিসেবে এ-উপন্যাসের বিশিষ্টতাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব :

এক. শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গীকার এবং চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তার সচেতন প্রয়োগ।

দুই. যে অর্থে ঔপন্যাসিককে সামাজিক পরিবর্তনশীলতা, কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং তার সংঘাত ও সংকটের সাথে পরিচিত থাকতে হয়,[২২] "উত্তরণ" উপন্যাসে সত্যেন সেনের অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের উৎসমূলে তা ক্রিয়াশীল।

তিন. উপন্যাসে বিধৃত-কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সজ্ঞান সচেতনতা।

চার. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির সাহায্যে সামজিক গতি এবং ব্যক্তির ক্রমবিকাশের পরস্পরিত-জটিল অবস্থার রূপায়ণ।

পাঁচ. 'মানবিক রূপান্তর বা 'হিউম্যান মেটামরফসেস'কে ব্যক্তি-জীবনের ছন্দ-ভাঙা, ছন্দ-গড়ায় মূর্ত করা'।[২৩]

জীবনের মহাকাব্যিক আয়তনকে নিরাসক্ত, সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যেন সেন "উত্তরণ" উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর কালের সামাজিক গতির অন্তর্সত্য ও বহির্সত্য, তার কার্য-কারণ সম্বন্ধ, তার সঙ্কট ও সংঘাত মালেক এবং অনুষঙ্গী চরিত্রপুঞ্জের জীবনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন তিনি। ব্যক্তি মালেকের হয়ে-ওঠার দ্বন্দ্বময় পথ-পরিক্রমায় তার শ্রেণীগত অস্তিত্বের ভিত্তি ও ক্রম-রূপান্তর বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশের উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত সমাজ-কাঠামোর আর্থ-উৎপাদন ব্যবস্থা, ১৯৪৭-পরবর্তীকালে তার পরিবর্তিত

স্বরূপ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির প্রয়োগ এ-উপন্যাসকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। প্রধান চরিত্র মালেকের ব্যক্তি-জীবন, বিচিত্র সংকট, সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার মানবিক রূপান্তর "উত্তরণ" উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপজীব্য। প্রকৃতপক্ষে এ-উপন্যাসে সত্যেন সেন কৃষিজীবনমূলাশ্রয়ী জীবনাভিজ্ঞতা থেকে শ্রমজীবী মানুষের প্রোলেতারীয় জীবনের সমগ্র রূপের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।

উপন্যাসের সূচনা হয়েছে একটা ইঙ্গিতময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে। নদীর চলমানতার পটভূমিতে উন্মোচিত সূচনাংশে গতির যে আপেক্ষিকতার ইঙ্গিত বিদ্যমান, সেখানে পরিবর্তমান সময়, সমাজ এবং তার অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর উত্তরণহীন জীবনবৈশিষ্ট্যই যেন প্রতীকায়িত হয়েছে:

> ফ্ল্যাটের নাম নাগর। আই জি এন এ্যাণ্ড আর কোম্পানীর ফ্ল্যাট। কলকাতা থেকে বহু মালপত্রে বোঝাই হয়ে আসাম লাইনে চলেছে। চলেছে----অবশ্য নিজের চলৎশক্তি নেই। একদিকে নাগর, আর একদিকে গোদাগাড়ী এই দুটি ফ্ল্যাটকে দুবাহুর আলিঙ্গনে বেঁধে মংগোলিয়ান নামের স্টীমারটা গদাই লস্করী চালে এগিয়ে চলেছে। কোন তাড়াহুড়ো নেই, ধীরে সুস্থে যেন পান চিবুতে চিবুতে চলেছে।...
>
> নাগর ফ্ল্যাটের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারা একটানা মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে চলেছে।[২৪]

এই নাগর ফ্ল্যাটের টালি-সুকানী মালেক 'উত্তরণ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শ্রমজীবী মালেকের কর্মব্যস্ত জীবন দিয়ে উপন্যাস-কাহিনীর সূত্রপাত হলেও লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ তার অতীত ও বর্তমানকে কখনো সমান্তরালভাবে, কখনো ঘটনা-অনুষঙ্গে, আবার কখনো-বা চরিত্রচিত্তের অন্তর্ময় অনুভবগুচ্ছের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। মালেকের পারিবারিক পরিচিতির মধ্যেই 'কাঁচা বয়সের শ্রমময় জীবনের বেদনাময় কার্যকারণসূত্র নিহিত। পিতা নাজিম সিকদারের নৃশংস আচরণ, স্বামী-পরিত্যক্ত মায়ের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত জীবনযাত্রা, শিক্ষাজীবন পরিসমাপ্তির পূর্বেই গৃহমূল থেকে মালেকের বিচ্ছিন্ন হয়ে-যাওয়া—প্রভৃতির উন্মোচন ঘটেছে মূলত তার বেদনা-তরঙ্গিত স্মৃতি-উৎসের অনুভবে। তার স্বতন্ত্র জীবন-গতি, অনেকের

মাঝখানে থেকেও নিঃসঙ্গ ব্যক্তিক অস্তিত্ব, অনুভব ও কর্মধারার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে সামষ্টিকতায় উত্তরণ বহির্জাগতিক ঘটনাস্রোত এবং মানসক্রিয়ার দ্বন্দ্বজটিল পরিস্থিতি-পরম্পরায় উন্মোচিত হয়েছে। মালেকের আত্ম-সাক্ষাৎকার, আত্ম-সমীক্ষা এবং আত্ম-অনুসন্ধানের সূত্র যে তার চারিত্র-প্রবণতারই অন্তর্নিহিত সত্য, অপরিণত মালেকের অনুভবপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> নিজেকে নিয়ে তন্ন তন্ন করে ভেবে দেখেছে মালেক। সে জানে, এই বিপুল পৃথিবীর সংখ্যাহীন প্রাণীর জীবন মরণ আর উত্থান পতনের বিরাট পটভূমিকায় তার এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীবনের মূল্য কতটুকুই বা। কোথায় কোন সামান্য এক কীট কার পায়ের তলায় চাপা পড়ে আর্তনাদ করে, কে তার কৈফিয়ৎ চায়, আর কেই বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়। এ কথা সত্য, কিন্তু এ-ও তো কম সত্য নয় যে তার কাছে তার নিজের জীবন আর সব কিছুর চেয়ে মহার্ঘ্য, এর চেয়ে দামী জিনিস তার কাছে কিছুই নেই, থাকতে পারে না। উনিশ বছর বয়সের তরুণ মালেক যে এ-সব কথা স্পষ্টভাবে এবং যুক্তিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে ভাবতে পারে তা নয়, ইতস্ততঃ ঘা-খাওয়া বিশ্লিষ্ট আর এলোমেলো চিন্তাগুলি তাকে কেমন যেন বিহ্বল করে ফেলে।[২৫]

বেদনাময় অতীত-উৎস এবং স্বতন্ত্রমাত্রিক মানস-প্রবণতার কারণেই মালেক যেমন নিজস্ব নিয়মে বেড়ে ওঠে, তেমনি, সংবেদনশীল হৃদয়-ধর্মের অনিবার্য অভিঘাতে বস্তুময় বহির্বিশ্ব থেকে সে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ঘাত-প্রতিঘাত, সঙ্কট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হলেও জীবনমূল থেকে তার সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়নি কখনো। এ-কারণেই তার পক্ষে পরবর্তীতে শ্রেণী-সচেতন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। এবং জীবনবোধের এই বিশিষ্টতার কারণেই পৌরাণিক কাহিনী-আশ্রয়ী 'সীতার বনবাস' পালা অভিনয় দেখে সে জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার সাথে তার সাধর্ম্য নির্মাণ করে : 'অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মালেক, দেখতে দেখতে তার চোখের কোণে পানি এসে গিয়েছিল। এই কাহিনী যে তার কাছে একান্ত পরিচিত, তাদের জীবন নিয়েই তো এই মর্মান্তিক অভিনয় চলছে। তার মা-ই তো সেই নির্বাসিতা

সীতা। আর তার কোলের ধন লব-কুশ তারা দুটি ভাই মালেক আর রফিক। এ-যুগের রামচন্দ্র সীতাকে তার পদ্মাপারের বাপের বাড়ীতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর টাউনে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করছে। কোর্টের পেশকার, ডান হাতে যা পায়, বাঁ হাতে পায় তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী।'[২৬] অতীত বর্তমানের টানাপোড়েনের স্রোতে আবর্তিত মালেক বস্তুজাগতিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে ক্রমান্বয়ে জীবনবোধর নতুন প্রান্তে উপনীত হয়।

মালেক-চরিত্রের ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরকে সত্যেন সেন পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং অনুষঙ্গী চরিত্রের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসে রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপনের সূচনায় তিনি সামাজিক গতির নিয়মকে লঙ্ঘন করেননি। বাঙালির জাতীয় জীবনে রাজনীতির সূত্রপাত কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সমাজ বিকাশ ও তার আধুনিক শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার সাথে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভবের প্রসঙ্গ জড়িত। এই সচেতন বোধ থেকেই সত্যেন সেন রহমান চরিত্রের অবতারণা করেছেন। নিম্নবিত্ত কৃষকের সন্তান রহমান কিভাবে কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন ও জীবিকার আকর্ষণে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে এবং শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নিজ জীবনধারার সাথে অভিন্ন করে ফেলেছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তা উপস্থাপন করেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে মালেকের মানসবিকাশ ও আত্ম-আবিষ্কারের পথ পরিক্রমায় রহমানের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। মালেক অধীত বিদ্যা অপেক্ষা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে রহমানের স্মৃতিকথন ও বর্তমান সম্পর্কিত সচেতন উচ্চারণ থেকে। অধিকার-বিড়ম্বিত জাহাজী শ্রমিকদের কর্মধারা ও জীবনপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখক মালেকের আত্মানুসন্ধানের দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। যে-আত্মানুসন্ধান ব্যক্তিক স্তরকে অতিক্রম করে শ্রমজীবী মানুষের সামূহিক অনুভবে পরিণতি লাভ করেছে। মালেকের এই সমষ্টিচেতনার সূত্রপাত রহমানের উচ্চারণ থেকে: 'আমি তো মনে করি, আপনিও আমাদের এই হতভাগাদের মতই একজন। কিন্তু তবু আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে——এখানে যারা আমাদের দিনরাত্রির সুখদুঃখের সাক্ষী, তাদের কারু সম্পর্কে কোন দিন কোন খোঁজ নিয়েছেন? কে কেমন আছে, কার দিন কিভাবে

চলছে, এই কথাটুকু জানতে চেয়েছেন কোনদিন।'[২৭] রহমানের উক্তি সারেং সাহেবের ভাগনে মালেককে গভীর আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে যদি ব্যক্তিস্বার্থকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করে, তাহ'লে হয়তো শ্রেণী অবস্থানের রূপান্তর সাধন করে এক সময় খালাসীতে উত্তীর্ণ হয়ে শোষকের পদে অধিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মালেক 'অনেক ভাবতে হবে, অনেক জানতে হবে'---এই সচেতন পন্থাকে অবলম্বন করে। মালেকের এই ভাবনা ও জানার পথে ইতিবাচক ইন্ধন সঞ্চার করে রহমানের আত্মরূপান্তরের ইতিকথা।

চলমান জীবনচিত্র, তার পরিবর্তনশীলতার অন্তর্গত-বহির্গত স্বরূপের সাথে মালেকের জীবনে অভিজ্ঞতার নব নব প্রান্তের উন্মোচন এবং তার রূপান্তর বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকারণসমম্বন্ধযুক্ত করে বিন্যস্ত করেছেন সত্যেন সেন। কিন্তু মালেকের এই সচেতন জীবনধারাকে লেখক তত্ত্বময় ও নিরস করে তোলেন নি। জীবনের সাথে, আবেগ-অনুভূতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ-বেদনাময় পারিবারিক উৎসও তার জীবনের অনিবার্য অংশ হিসেবেই বিধৃত হয়েছে উপন্যাসে। শ্রমিকদের অধিকারবোধ এবং প্রতিবাদের শাস্তিস্বরূপ রহমান এবং আলমের আকস্মিক চাকরিচ্যুতি এবং নির্জন চরে জোরপূর্বক নামিয়ে দেয়া মালেকের জীবনাভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এক নতুন সঞ্চয়। এ ঘটনা থেকেই তার জীবনে আত্মরক্তক্ষরণ ও আত্ম-উজ্জীবনের সূচনা। এর পর থেকে শুরু হয় মালেকের চাকুরী জীবনের দ্বিতীয় স্তর। জাহাজের চাকরিত্যাগের উৎসমূলে ক্রিয়াশীল আত্মসমীক্ষা তার উত্তরণমুখী জীবনচেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

> ...লোকে বলে মানুষ আস্থার দাস, কি জানি, দেখতে দেখতে এ সমস্ত হয়তো একদিন আমার গা সওয়া হয়ে যাবে। তারপর আমাদের আর একজন টালি-সুকামী জলিল সাহেবের মত আমিও এই মাল চুরির কাজে শরীক হয়ে যাব। মামা ভরসা দিয়েছে, বছর কয়েক বাদেই আমাকে কোন একটা ফ্লাটের সারেঙ বানিয়ে দেবে। অসম্ভব নয়, উপরওয়ালের কাছে মামার সুপারিশের জোর আছে। তখন আমিও মামার মতই গরীব খালাসীদের রক্ত শুষে মোটা হয়ে চলব।[২৮]

মায়ের উদ্দেশে উচ্চারিত মালেকের এই উক্তি তার শ্রেণীসচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গিরই অভিব্যক্তি। কিন্তু মালেকের জীবনধারার রূপায়ণে তার ব্যক্তিক

এবং রাজনৈতিক অবস্থাই লেখকের মৌল লক্ষ্য হয়ে থাকেনি, পারিবারিক জীবন, সেই জীবনসম্পৃক্ত বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সাথে গভীর সম্পর্কময় অবস্থার বর্ণনাও তাঁর সমগ্রতাসন্ধানী জীবনদৃষ্টির সাক্ষ্যবাহী।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে মালেকের দীর্ঘায়ত, জটিল এবং কঠোর সংগ্রামময় জীবনের স্বরূপ রূপায়িত হয়েছে। এই স্তরে সে কলকাতার বৃহত্তর জীবনপটভূমিকায় অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত। এবং কলকাতা-জীবনেই সত্যিকার অর্থে তার শ্রমিক-জীবনের সূচনা—প্রলেতারীয় সহমর্মিতায় তার মন-মানস উজ্জীবিত, আপ্লুত:

> এমন একটা আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেল মালেক। এরা সবাই শ্রমিক----নানা কারখানায় কাজ করে। এদের মধ্যেই থাকবার জায়গা হয়ে গেল। এরা সবাই একসঙ্গে মেসিং করে খায়। সেই সঙ্গে তার খাওয়াটাও চলল। সে ভালমানুষী করে না চাইতেই খাওয়া খরচ বাবদ আগাম তিনটা টাকা তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। সর্বসাকুল্যে তার হাতে ছিল মাত্র পাঁচটা টাকা। তা থেকে তিন টাকা গেলে বাকী থাকে মাত্র দুটো টাকা। চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত এই দুটাকার উপরেই নির্ভর করে চলতে হবে। কিন্তু এ দিয়ে কতদিন চলতে পারে। তা ছাড়া চাকরী পেলেই বা কি? মাস না কেটে গেলে তো মাইনা দেবে না। তা টাকাটা দিতে গিয়েও মনের মধ্যে কামড় মারছিল।
>
> ওরা ধমক দিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে দিল। বলল, কত ন'শো পঞ্চাশ টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ হে? টাকায় বুঝি কামড়ায়, না? রাখো এখন তোমার টাকা। যদ্দিন কোন চাকরী না জুটছে ততদিন তুমি আমাদের মেহমান। আগে একটা চাকরী যোগাড় করে নাও তো তারপর দেখা যাবে।[২৭]

কলকাতার বিপুল জনসমুদ্রে মালেকের এই আশ্রয় একদিকে যেমন তার প্রেরণা-উৎস, অন্যদিকে চাকুরি সন্ধানের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত আত্মদ্বন্দ্বের অভিঘাত থেকে মুক্তির দিগ্‌নির্দেশনা। ম্যাট্রিক পাশ মালেক একজন সাধারণ শ্রমিকের কঠোর জীবন ও কর্ম-অবলম্বনের প্রশ্নেও এ-কারণেই অনেকটা নির্দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এ মালেকের চাকরি প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সূচিত হলো তার জীবনের নতুন অধ্যায়।

ঠিক শ্রমিক হিসেবে নয়, শ'-খানেক শ্রমিকের সুভারভাইজার হিসেবে। মালেকের এই চাকুরি-জীবন প্রসঙ্গে কারখানার বাঙালি ম্যানেজার মনোজ আতর্থীর যে চরিত্ররূপ উন্মোচিত হয়েছে, তা কেবল মালেকের ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক থেকে নয়, সমকালীন সমাজ-রাজনীতির পটভূমিতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে উজ্জ্বল। মালেকের চাকুরী জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদ-বুদ্ধি-তাড়িত শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ৪৭-এর ভারত বিভক্তি সমগ্র সমাজজীবনকে যে-ভাবে 'ক্ষতবিক্ষত' ও ভারসাম্যহীন করেছে, সমাজ-অস্তিত্বের অনিবার্য অংশ হিসেবে মালেকও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় সঙ্গত কারণেই। দাঙ্গা, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলমান হিসেবে মালেকের দ্বন্দ্বজীর্ণ পাকিস্তান-সমর্থন--- প্রভৃতির উন্মোচন প্রসঙ্গে সত্যেন সেন সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার একটা সামগ্রিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। দাঙ্গা-পরবর্তী পরিস্থিতি-সম্পর্কিত মনোভঙ্গির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত, বস্তুনিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম-গভীর চৈতন্যরূপ :

> দাঙ্গা থেমে গেছে সত্য, কিন্তু মানুষের মনে বিদ্বেষের আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। শহরের আবহাওয়া সেই ধোঁয়ায় কলুষিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এখানে এখন মানুষ বলে কোন প্রাণী নেই, আছে একদল হিন্দু আর এক দল মুসলমান। ধর্মের পায়ে, সাম্প্রদায়িকতার পায় এরা মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। কাজে এবং চিন্তায় কে কতদূর বর্বর হতে পারে, দু'দলের মধ্যে তাই নিয়ে চলেছে প্রতিযোগিতা।[৩০]

যে দাঙ্গা মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছে, তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণা কেমিক্যাল ওয়ার্কস থেকে মালেকের চাকরি চলে যায় : 'চলে এল মালেক। তার সহকর্মী হিন্দু ভাইরা উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলল না। সে যে মুসলমান, মালেক তার জীবনে একথাটা আর কখনও এমন প্রবলভাবে অনুভব করেনি। আবার পথে ভাসল মালেক। আবার সেই পথে পথে ঘোরা আর অফিস ও কারখানার গেটে গেটে মাথা ঠুকে মরা'। এমনিভাবেই মালেকের জীবনে নতুন নতুন সঙ্কট ও অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা উপন্যাসের ঘটনাধারাকে ক্রমজটিল এবং দ্বন্দ্বময় করে করে তুলেছে। মালেকের

ঘটনাবহুল জীবনের চাকরি-প্রাপ্তি, চাকরি-চ্যুতি এবং নিত্য নব পরিস্থিতির উদ্ভাবনায় তার মনোজগতের দ্বন্দ্বময় স্বরূপ——প্রভৃতি বিষয়কে ঔপন্যাসিক অনিবার্য কার্যকারণসম্পৃক্ত করে বিন্যস্ত করেছেন। জীবিকার সন্ধানে শিক্ষিত মালেক সাধারণ ফিরিওয়ালায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এতো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির মধ্যেও মনোজ আতর্থীর মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা কেবল মালেকের ব্যক্তিজীবনের দিক থেকে নয়, ঔপন্যাসিকের জীবনবোধেরও আলোকময় প্রান্তস্পর্শী। মনোজ আতর্থীর সহযোগিতায় মুসলমান-পরিচালিত কারখানায় চাকরি-প্রাপ্তি মালেকের জীবনধারাকে পুনরায় করে তোলে স্বাভাবিক।

মনোজ আতর্থী চরিত্র-পরিকল্পনায় সত্যেন সেন তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের স্বরূপসত্যকে প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেসী রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা, তার আদর্শের অবক্ষয়ের রক্তাক্ত ও বিপন্ন অবস্থার রূপায়ণে মনোজ আতর্থীর জীবনধারা ও পরিণতি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আভাসিত। তাঁর সংস্পর্শে এবং ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রবাহ মালেককে ক্রমাগত রাজনীতিসচেতন হতে সহায়তা করেছে। তার রাজনীতি-সচেতনতার সূত্রপাত আত্মরক্তক্ষরণ ও আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে। ঔপ-ন্যাসিক মনোজ আতর্থীর একটি মাত্র উচ্চারণে সাতচল্লিশের 'স্বাধীনতা'র স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন :

> কিন্তু এই স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি। যে-স্বাধীনতার স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তার রূপ এ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন গেছে তখন যখন আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে সংগ্রামের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম,... আর আজ? আজ ভাবছি, এ আমরা কোথায় এলাম আর কোথায় চলেছি।[৩১]

এই 'স্বাধীনতা' যে বাঙালি জাতির চলমান ইতিহাসকে রক্তস্রোতে অন্যধারায় প্রবাহিত করেছে, উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় তা-ই বিধৃত। ১৯৪৮ সালের ২১শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী হত্যার মধ্য দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র দানবী শক্তি'র 'রক্তাক্ত থাবা'র স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এর পর থেকে শুরু হলো মালেকের জীবনের নবতর অধ্যায়—তার শ্রেণীসচেতন রাজনীতিতে দীক্ষাগ্রহণ। 'ইয়ে আজাদী জুটা হ্যায়,

ভুলো মৎ ভুলো মৎ/দুনিয়ার মজুর কিষাণ এক হও! / আমাদের দাবী মানতে হবে! / লাল ঝাণ্ডাকী জয়!'—এই নব জীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত মালেক উপনীত হলো আত্মরূপান্তরের সংশ্লেষপ্রবণ পটভূমিতে। তার অভিজ্ঞতায় মনোজ আতর্থীর আদর্শবোধের চাইতেও বিপ্লবীদের কর্মধারা এবং আদর্শচিন্তা বস্তুনিষ্ঠ, জীবন্ময়। তার কৌতূহল ও জীবনজিজ্ঞাসায়, আত্ম-উন্মোচন ও আত্মসমীক্ষায় সে-সত্যেরই যাথার্থ্য প্রমাণিত। এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মালেকের আত্ম-রূপান্তরের শক্তি-উৎস:

> এই যে বরানগরের বিড়ি-শ্রমিক বুড়ো ইয়াসিন, বয়সে সে আতর্থীর চেয়ে অনেকটা বড়, কিন্তু একবার তাকিয়ে দেখ তার দিকে! উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতই জ্বলছে। বয়সের ময়লা তার ঔজ্জ্বল্যকে চাপা দিতে পারেনি। না বয়স নয়, আসল কথা আতর্থীর সামনে চলার কোন পথ নেই। সে আজ হতাশ, মোহভঙ্গের ফলে বিভ্রান্ত, পিছনের দিকে তাকিয়ে তার চোখ অশ্রুসজল।
>
> আর এরা? এরা নতুন জীবনের ডাক শুনেছে, এদের সামনে অবারিত পথ। এদের কতটুকুই বা শক্তি, কিন্তু কত বড় এদের স্পর্ধা। এরা সামান্য হলেও অসামান্যের ইঙ্গিত বহন করে। এরা যেন অন্ধকার রাত্রির অন্তে নূতন প্রভাত সূর্যের রক্তিম আভাস।[৩২]

হিন্দু অথবা মুসলমান অপেক্ষা মানুষের শ্রেণী-অবস্থানই যে সবচেয়ে বড় সত্য, এই মীমাংসিত বোধ---শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কের ফলে উপলব্ধি করে মালেক। মালেকের অভিজ্ঞতায় মনোজ আতর্থী অপেক্ষা বুড়ো ইয়াসিনের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। চরে পরিত্যক্ত রহমানের সাথে পুনরায় কলকাতায় সাক্ষাৎ, রূপান্তরিত মালেকের পরম-প্রাপ্তি। কিন্তু মালেকের আত্ম-উজ্জীবনের এই আলোক-উদ্ভাসিত স্তরেই ঘটে তার পিতার মৃত্যু। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মালেক পিতৃতান্ত্রিক সংসারে নারীর অসহায় অবস্থার যে-রূপ প্রত্যক্ষ করে তার মায়ের নৈঃসঙ্গ্য ও বেদনার্দ্র অভিব্যক্তিতে, তা-ও তার অভিজ্ঞতার অন্যতর সঞ্চয়। স্বামী-পরিত্যক্ত হলেও তো তার মা আমিনা বেঁচেছিলো একটা মানসিক আশ্রয়ের মধ্যে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু যেন তাকে উন্মূলিত করে দিলো। মালেকের আত্ম-রক্তক্ষরণের এক গভীর কার্যকারণ মায়ের মৃত্যু।

রূপান্তরের পথ-যাত্রায় মায়ের মৃত্যু এবং মালেকের চিত্তে তার যে প্রতিক্রিয়া, তা সম্ভবত সমগ্র উপন্যাসের সবচেয়ে আবেগস্পন্দিত ও ব্যঞ্জনাময় অংশ:

> মা? মা কেমন আছে, রুফু?
>
> রুফু তবু কোন কথা বলল না, শুধু হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ইসারা করে দেখাল। কয়েক হাত দূরে একটা কবর। রুফুর হাতটা সেই দিকেই প্রসারিত।
>
> কবরটা নতুন। পাড়ার কেউ হয়তো মারা গেছে। কে কে মারা গেল? এখন থাক পরে শোনা যাবে। তার আগে মায়ের খবরটা জানা দরকার। কিন্তু এমন করছে কেন রুফু? তার কথার জবাব দিচ্ছে না কেন?
>
> সে অধৈর্যের সুরে চেঁচিয়ে উঠল, মা কেমন আছে বলনারে?
>
> রুফু আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে সশব্দে কেঁদে উঠে বলল, ভাইয়া, মা নাই, মা মরে গেছে।
>
> কি বলল, কি বলল রুফু? মা মরে গেছে? মা নাই? মালেকের মাথাটা কেমন করে উঠল। তার পায়ের তলার মাটিটা বিষম টলছে। ভাবল, বসে পড়লে হয়। কিন্তু বসবার মত শক্তিটুকুও তার নাই। হঠাৎ তার চোখের কাছে সব কিছু এলোমেলো আর ঝাপসা হয়ে এল। মনে হ'ল, কে যেন বহু দূর থেকে ডাকছে, ভাইয়া! ভাইয়া! কে ডাকছে? কাকে ডাকছে?[৩৩]

চেতনার নব-প্রান্তে উত্তরণ এবং মায়ের মৃত্যু---এই দুই বিপরীত ঘটনার অভিঘাতে মালেক-চিত্তের যে রক্তাক্ত টানাপোড়েন----তার মধ্য দিয়ে ঘটেছে উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি।

মায়ের মৃত্যুজনিত প্রতিক্রিয়া, বিভাগোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্কটময় নবযাত্রা, উপনিবেশবাদের নব্য-প্রতিষ্ঠা, খালাতো বোন জুলেখার বৈবাহিক জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতিতে মালেকের

সংবেদনময় চিত্তের নব-উন্মেষ, কলকাতা থেকে প্রাপ্ত-চিঠিতে সেখানকার অস্থির অবস্থাসম্পর্কিত তথ্য পেয়ে কর্মজীবন সম্পর্কে তার নতুন সিদ্ধান্তগ্রহণ----প্রভৃতি বিষয়কে সত্যেন সেন নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত করেছেন উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে। নারায়নগঞ্জে জুট কোম্পানীতে চাকরি-গ্রহণের মধ্য দিয়ে সূচিত হলো মালেকের জীবনের পরিবর্তিত নতুন অধ্যায়----তার রূপান্তরমুখী জীবনসংগ্রামের সংশ্লেষ-পর্ব।

পাট কোম্পানীর চাকরির অভিজ্ঞতা-সূত্রেই মালেক বুঝতে সক্ষম হলো শোষক ও শোষিতের সত্যিকার ব্যবধান-সীমাকে, বুর্জোয়া শোষণের মুনাফা-কেন্দ্রিক প্রশাসন-প্রক্রিয়ার চরিত্ররূপ। শ্রমিক-শ্রেণীর সংঘবদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মালেকের আত্ম-উন্মোচনের মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের প্রত্যাশিত জীবনার্থ---মালেকের রূপান্তরিত, উত্তীর্ণ সত্তার জীবন্ময় স্বরূপ :

> আনন্দ, আনন্দ----এত আনন্দ মালেক তার জীবনে আর কখনও পায়নি। একটা প্রচণ্ড আঘাতের মধ্যে দিয়ে বাইরের বাধা ভিতরের বাধা সবকিছুই অপসারিত হয়ে গেছে। এত দিনের সংকীর্ণ পরিবেশের বেষ্টনী ভেঙে বিপুল জনতার মাঝখানে এসে পড়েছে। এর মধ্যেই তার মুক্তি। সকল আনন্দের বড় আনন্দ, সে আজ সেই আনন্দের স্বাদ পেয়েছে।
>
> ...এরই মধ্যে এরই পাশাপাশি আর এক স্বপ্ন পেয়ে বসল তাকে। মৃত্যুর বুকে নবজন্মের মত অন্ধকারের বুকে আলোক শিখার মত ওই স্বপ্নের মধ্যে এক অনাগত নতুন দিনের আগমনী। রহমান ভাইয়ের চোখে, হারুণদের চোখে, এই স্বপ্নের ছায়া দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল।[৩৪]

মালেকের এই প্রত্যাশাদীপ্ত, সংগ্রামশীল জীবনে তার স্বশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সাধনার পাশাপাশি সংযুক্ত হলো নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ সম্পূর্ণ মানুষ রুফু---ছোটভাই রফিক এবং সংগ্রামশীল জীবনে ভালোবাসার নির্ভীক মন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলো জুলেখা। প্রকৃত অর্থেই সময়চেতনা, জীবনচেতনা এবং শ্রেণীচেতনার রাসায়নিক সংশ্লেষে "উত্তরণ" সত্যেন সেনের মহত্তর শিল্পকর্ম। কাহিনীর প্রলম্বন, বর্ণনার অবাঞ্ছিত বিস্তার, অসংলগ্ন

প্লট-পরিকল্পনা এবং চরিত্র-চিত্রণে বহির্বাস্তবতার প্রতি সীমাতিক্রমী আকর্ষণ সত্ত্বেও অন্তর্ময়, সংবেদনময় জীবনের রক্তাক্ত সংগ্রামী পথযাত্রায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মালেকের আত্ম-উত্তরণ বা রূপান্তর (Self-metamorphosis) এ-উপন্যাসকে জীবনের সমগ্র রূপের শিল্পরূপে অভিষিক্ত করেছে।

চার

বিষয়কল্পনা, জীবননির্বাচন এবং শিল্পকৃতির দিক থেকে "মা" সত্যেন সেনের ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। দৃষ্টিশক্তিহীন[৩৫] শিল্পী অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনকে এ-উপন্যাসে যে-গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিন্যস্ত করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বিষয়ের শিল্পাতিরেক প্রলম্বন, বর্ণনার বিস্তার এবং চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচর্যাপ্রবণতা "মা" -তে অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন তিনি। যে-কারণে ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হিসেবে এ-গ্রন্থ অনেকটা সাফল্যস্পর্শী।

"মা" জাতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাপক আন্দোলন-আলোড়নের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস নয়, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বন্দ্ব-জটিল রাজনীতিপ্রবাহের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার অনুপুঙ্খ রূপায়ণ ঘটেছে এ-উপন্যাসে। বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মধারা, তার দ্বন্দ্বময় চরিত্ররূপ এবং ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের মীমাংসিত সীমা নির্দেশের প্রশ্নেও "মা" তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাদের দ্বন্দ্ব-অতিক্রমণের রক্তাক্ত পথযাত্রা এবং সবকিছুর কেন্দ্রমূলে এক ব্যতিক্রমী নারী সঞ্চরণক্ষম ও রাজনীতি-সচেতন অস্তিত্বের ইতিবাচক পরিণাম-নির্দেশক সক্রিয়তা এ-উপন্যাসকে বিশেষত্বপূর্ণ করেছে।

"মা" উপন্যাসের পটভূমি 'বাংলাদেশের একটি শহর। শহর আয়তনে ছোট। লোক সংখ্যাও বেশী নয়। শহর নাম ধারণ করলেও গ্রাম্য জীবনের ভাবটা এখনও কিছুটা বজায় আছে।'[৩৬] কিন্তু এই পটভৌমিক পরিচয় উন্মোচনের পূর্বেই একটা নাটকীয় আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে উপন্যাস-কাহিনীর সূচনা। এই নাটকীয়তা যে জীবনানুষঙ্গী, বাঙালি জাতির জীবন ও রাজনীতিপ্রবাহের নাটকীয় রূপ-রূপান্তরের-ই

অনিবার্যতার বহিঃপ্রকাশ, তা সত্যেন সেনের উপন্যাস-বিবেচনার ক্ষেত্রে অধিকতর সত্য। শৈলী-বিচারের দিক থেকে এই নাট্যগুণ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের-ই বৈশিষ্ট্য। বিভুর বন্ধু প্রবাল তিন বছর রাজবন্দী হিসেবে কারাবাসের পর প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন মিলনের আনন্দে উল্লাসময় হলেও, আদর্শগত বিচ্ছেদের আকস্মিক প্রকাশে হয়ে উঠলো দ্বন্দ্বময়----মানবিক সম্পর্কের সাথে আদর্শের সংঘাতে জটিল, রক্তাক্ত। কারাজীবনে বিচিত্র মানুষের সম্পর্ক, অধীত বিদ্যা, আত্মবিশ্লেষণ এবং তুলনাবিচারের মধ্য দিয়ে প্রবাল মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকেই সমাজবিবর্তনের অনিবার্য দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। জেলে গমনের পূর্বে সে ছিলো কংগ্রেসের নিবেদিত-প্রাণ সক্রিয় কর্মী। কিন্তু বিভুর জীবন ও আদর্শবোধ কংগ্রেসী রাজনীতির প্রথাগত সংস্কার ও নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা। পার্টির নির্দেশ এবং তত্ত্বজ্ঞান-হীন, অনুশীলনহীন অনুরাগের ফলে প্রবালের এই বিবর্তিত আদর্শকে সে গ্রহণ করতে কুন্ঠিত। প্রবালের এই আদর্শগত জন্মান্তর ঘটার ফলে জেলে থাকা অবস্থায়-ই আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটি তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রবালের উচ্চারিত উক্তি-পরম্পরার মধ্য দিয়ে একজন তরুণের রাজনৈতিক আদর্শের রূপান্তর এবং অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের মর্মরূপ বিধৃত হয়েছে। বিভু এবং প্রবালের কথোপকথনে সে-সত্যই প্রতিবিম্বিত :

> দশ বছর আগে স্বামীবাগের বটগাছটার তলায় বিনয়দার সামনে বুকের রক্ত দিয়ে যেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম, তার কথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।
>
> আবার হেসে উঠল প্রবাল ; বুকের রক্ত দিয়ে---হা হা হা! ছেলেবেলাকার সেই রোমান্সটাকে তুমি এখনও এত যত্ন করে পুষে রেখেছ ?
>
> অবাক হয়ে গেল বিভু। প্রবাল এ কোন ভাষায় কথা কইছে। মাত্র তিন বছর, এরই মধ্যে এত পরিবর্তন হয়ে গেছে।···
>
> হেসো না, একটু কঠিন সুরে বলে উঠল বিভু, আমরা ছেলে মানুষ ছিলাম সে কথা সত্য, কিন্তু এই পবিত্র অনুষ্ঠানের যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা ছেলেমানুষ ছিলেন না।

> তাঁদের বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।

> যাঁদের কথা বলছ তুমি, তাঁরা বয়সে ছেলে মানুষ নন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের বয়সের পরিণতি লাভ করেননি। যত সব স্বপ্ন দেখা বুড়ো শিশুর দল। সারা বিশ্ব জুড়ে আজ ওলটপালট হচ্ছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নাই, তারা এখনও পিছন দিকে তাকিয়ে রূপকথার স্বপ্নলোকের মধ্যে ডুবে আছে, আর ভাবাবেগে প্লাবিত বাংলাদেশের উর্বর মাটিতে সেই স্বপ্নের বীজ বুনে বুনে চলেছে।[৩৭]

কংগ্রেসী রাজনীতির চারিত্রনির্দেশের প্রশ্নে প্রবালের মন্তব্য লেখকেরই রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিধ্বনি। এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব থেকেই বিভুর সাথে বিচ্ছেদ ঘটে যায় প্রবালের। বিভুর মনে হয়, 'তার চির পরিচিত প্রবাল যেন আর এক জগৎ থেকে কথা বলছে। তাদের দু'জনের মাঝখানে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।' প্রবালের চূড়ান্ত উক্তির মধ্যে এই ব্যবধানের মৌল সূত্র নিহিত: 'তুমি আমাকে আমার গোঁ ছাড়তে বলেছিলে। কিন্তু এইখানেই তোমার ভুল, এ গোঁ নয়, এ হচ্ছে আমার বিবেকবুদ্ধিসম্মত সুচিন্তিত মত। আমি ঘর ছাড়তে পারি, কিন্তু আমার আদর্শ যে আমি ছাড়তে পারি না।'[৩৮] প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেসকর্মী প্রবালের নতুন আদর্শের প্রবর্তনা এলাকার রাজনীতি-প্রবাহে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কংগ্রেস, সন্ত্রাসবাদ এবং স্বদেশী আন্দোলনের সংস্কারের অচলায়তন যেন নতুন প্রাণের স্পর্শে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

তত্ত্বাবেগ যখন কোন ব্যক্তির জীবনাবেগের মৌল শক্তিতে পরিণত হয়, এবং সেখানে যদি থাকে বুদ্ধি এবং মেধার নিয়ন্ত্রণ তখন কোনো প্রকার বাঁধাই তার চলার গতিরোধ করতে অক্ষম। বুদ্ধিশাসিত প্রবালের উচ্চারণ তাই তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের ঘটনাধারায় সে এককভাবে যে-বিরাট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, নিজের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে নতুন রাজনৈতিক বৃত্ত সংগঠনে নিয়োগ করে সফল হয়েছে, তার উৎসমূলে রয়েছে বুদ্ধিচালিত প্রাণাবেগ তথা জীবনীশক্তি:

> আদর্শ কোন স্থাবর পদার্থ নয়। কোন কিছুর মোহেই আমি আমার আদর্শকে বিসর্জন দেইনি। তবে জীর্ণানি বাসানি যথা

> বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি পরোহপরানি, তেমনি আমি কালজীর্ণ পুরানো আদর্শকে ত্যাগ করে নতুন আদর্শকে গ্রহণ করতে চলেছি। অন্ধেন নীয়মান অন্ধের মত নয়, আমি আমার নিজস্ব বুদ্ধি আর যুক্তির আলোক হাতে নিয়ে পথ দেখে দেখে চলতে চাই।[৩৭]

এই 'যুক্তির নতুন আলোক' বিভু এবং প্রবালকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। তাদের 'দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিভুর প্রাণপ্রিয় পার্টি আর সুকঠিন আদর্শবোধ।' কিন্তু কেবল বিভু নয় এলাকার পুরানো সহকর্মী এবং প্রণয়িণী বীথি থেকেও আদর্শবোধের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্রবাল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেন্দ্রিক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনসৃষ্টির ইতিবৃত্ত রচনার অনুষঙ্গে সত্যেন সেন এ-উপন্যাসে কংগ্রেসী রাজনীতির ইতিহাসপরম্পরা, সমাজপ্রগতির সাথে সাথে তার আদর্শ ও লক্ষ্যের পশ্চাৎপদতা, অন্তঃসারশূন্যতা, বিকৃতি প্রভৃতিকে রূপায়িত করেছেন। যে-কারণে প্রবাল প্রবর্তিত নব্য-আদর্শের ভীতি কংগ্রেসের কর্তা ব্যক্তিদেরকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা প্রথমে কঠোরতা এবং পরে নীতি-নিয়মবহির্ভূত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে প্রবালের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের সচেতন তরুণ অংশ ক্রমাগত প্রবালের বুদ্ধিদীপ্ত নব্য-আদর্শের আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করে। বিভুর উদ্দেশে উচ্চারিত বীথির উক্তি কংগ্রেসের অচলায়তন-বন্দী জীবনের অন্তঃস্থল-উৎসারিত যন্ত্রণারই বহিঃপ্রকাশ: 'রাজনীতিগত মত পার্থক্য থাকবে বলে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলতে পারবে না?' এই প্রশ্নের উৎস নিহিত রয়েছে কংগ্রেসের অগণতান্ত্রিক পার্টি-কাঠামোর অন্তরালে। প্রবালের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণভীতি থেকেই পার্টির সমস্ত কর্মীকে তার সাহচর্য ত্যাগের নির্দেশ দেয়। যা বীথির জন্য এক মর্মান্তিক পরীক্ষা। কিন্তু ব্যক্তি ও ও ব্যক্তিত্বের এই সংঘাতময় টানাপোড়েনের মধ্যে মা নামক যে-বিশাল প্রেমময়-প্রাণময় অস্তিত্বকে সত্যেন সেন উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসে, তার রাজনৈতিক জীবন-ইতিহাস, কর্মধারা, কল্যাণকামী মানববাদ এবং সমন্বয়ী জীবনদৃষ্টি উপন্যাসের কাহিনীস্রোতকে প্রত্যাশিত মীমাংসায় উত্তরণে সহায়তা করেছে। বীথির দ্বন্দ্বময় অস্তিত্বস্বরূপের মূলেও রয়েছে তার জীবনের প্রোথিতমূল রাজনীতিসচেতনতা—যার শেকড় মৃত্তিকা-স্পর্শী, কিন্তু প্রগতির অগ্রযাত্রায় দ্বিধান্বিত।

মা-এর জীবনকথায় সত্যেন সেন ভারতীয় রাজনীতির সুদীর্ঘ কাল-পরিসরে পরিব্যাপ্ত ইতিহাসকে রূপায়িত করেছেন। বীথির জীবনের হয়ে-ওঠার পশ্চাতেও এই জীবন ও রাজনীতি-প্রবাহ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যে-কারণে তার পক্ষে প্রবালের আদর্শকে সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে যে-মেয়ের শৈশব-কৌশোর ও যৌবনের ক্রমবিকাশ, তার পক্ষে এই দ্বন্দ্বের মাত্রা প্রবলতর হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। 'ব্যক্তির আত্মনিগ্রহ রাজনৈতিক উপন্যাসের একটা বড় ব্যাপার। কেননা, দলীয় যান্ত্রিকতার মাঝখানে ওই আত্মনিগ্রহই ব্যক্তির নিজস্ব জগৎরূপে মূর্তি পায়।'[৪০] এই আত্মনিগ্রহ বিভু অপেক্ষা বীথিকে রক্তাক্ত করেছে বেশী। বীথির উদ্দেশে উচ্চারিত তরুণ কংগ্রেস-কর্মী প্রণবের জিজ্ঞাসার মধ্যেই এই আত্মরক্তক্ষরণের যন্ত্রণা-উৎস নিহিত: 'বিপ্লব অনেক বড় জিনিস, কিন্তু সেই বিপ্লব যারা করছে তাদের মন এমন সংকীর্ণ কেন?'[৪১]

কংগ্রেসের সংকীর্ণ নির্দেশে কেবল বিভু বা বীথি থেকে নয়, মায়ের বাড়ি থেকেও প্রবাল বিদায় নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তার রাজনৈতিক কর্মধারাও গতি এবং বিস্তৃত প্রায়। আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি শমিক-দের মধ্যেই সে নিজের আবাস রচনা করে। তার সাংগঠনিক তৎ-পরতায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের অনুসারীদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'সন্ত্রাসবাদের ফাঁদ' থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসে যুগোপযোগী রাজনৈতিক মতাদর্শের জীবন্ময় ও প্রাণপ্রদীপ্ত আকর্ষণে। কেশরাম কটন মিল-কে কেন্দ্র করে প্রবালের রাজনৈতিক সংঘশক্তি পূর্ণতর রূপ লাভ করে। মিলের শ্রমিকদের ওপর সামন্ত-পদ্ধতিতে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সে তিন মাসের মধ্যে শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন সংঘটিত করে তোলে; ফলে, একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য রূপ ধারণ করে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকদের ঐক্যও হয় সুদৃঢ়। প্রবালের প্রত্যাশিত শ্রেণীসংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা-বাস্তবায়নের পথ এভাবেই প্রশস্ততর হতে থাকে।

সত্যেন সেন পরস্পর-প্রবাহিত দু-টি ঘটনাধারাকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করেছেন এ-উপন্যাসে—বহির্বাস্তবতাসংলগ্ন প্রবালের রাজ-নৈতিক তৎপরতা এবং কংগ্রেসীয় রাজনীতির বিকৃত ও নীতি-বহির্ভূত

প্রতিরোধ-প্রক্রিয়াকে একদিকে, অন্যদিকে বীথি, বিভু-সুলতা এবং অন্যান্যের অন্তর্ময়, প্রশ্নবিদ্ধ ও যন্ত্রণাকাতর অন্তর্বাস্তবতা। সিবেন রায়ের উক্তির মধ্য দিয়ে লেখকের মীমাংসিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানেরই যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে:

> হ্যাঁ, আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।...
>
> আদর্শ হিসেবে সন্ত্রাসবাদের দিন গত হয়ে গিয়েছে। যারা এতদিন এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, তাদের আজ নতুন করে পথ নির্বাচন করতে হবে।[৪২]

সেই নতুন পথ, প্রবালের সহযোগী মোবারক-উচ্চারিত শ্রেণীসংগ্রামের পথ। এই শ্রেণী সংগ্রাম যে অনিবার্য, তার কারণও শ্রমিক-আন্দোলন রোধের প্রশ্নে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের ঐক্য থেকেই প্রমাণিত হয়। শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নের পথ প্রশস্ত করে, সমাজপ্রগতিকে অবরুদ্ধ করার প্রশ্নে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মধ্যে শ্রেণাচরিত্রগত ঐক্য ঔপনিবেশিক শাসনের শিক্ষা ও পরিচর্যারই অবদান। কিন্তু মুষ্টিমেয় শোষকের ঐক্য প্রবাল ও তার সহযোগীদের রক্তাক্ত করেও ব্যাপক আন্দোলনের গতিকে প্রতিহত করতে পারেনি, তা প্রকারান্তরে সংঘ-শক্তি থেকে জনশক্তিতে, জন শক্তি থেকে মিছিলে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু উপন্যাসের এই বহির্বাস্তবতার অন্তরালে বীথির জীবনে সংঘটিত ঘটনা যেন কংগ্রেসীয় রাজনীতির আঞ্চলিক বিকৃতিরই প্রতীকী অভিব্যক্তি। প্রবালের প্রেম এবং আদর্শকে একসাথে গ্রহণের ব্যর্থতায় তার যে দ্বন্দ্বময় আত্মস্বরূপ, তা উপন্যাসের অন্তর্ময়, যন্ত্রণারক্তিম এলাকা:

> প্রবাল বিথীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বীথি চমকে উঠে তার হাতটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এলো। আবার সেই ব্যবধান, দুস্তর ব্যবধান। দুজনের নিঃস্তব্ধ-তার মহাসমুদ্র। ...একি হোল! বীথির মন ভিতরে ভিতরে হাহাকার করে উঠল।...
>
> নিজের ভিতরকার এই রূপটা যা এতদিন তার কাছে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তা তার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে ভেসে উঠেছে।

> একদিকে পার্টি আর একদিকে প্রবাল, এই দোটানা দ্বন্দ্বে সে ভিতরে ভিতরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলেছিল।[৪৩]

কিন্তু মা একটা কল্যাণময় শুশ্রূষার হাত প্রসারিত করে উপন্যাসের ঘটনাধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করলো। আত্মিক টানাপোড়েনে বীথির মানসিক ভারসাম্যহীনতা, প্রচুর কর্মব্যস্ততা ও অনভ্যস্ত পরিবেশে দিনযাপনের ফলে প্রবালের শারীরিক অসুস্থতা,---দু'টি পৃথক ঘটনা হলেও মা-এর অন্তর্জগতে তার আবেদন তাৎপর্যময়। পীরপুরে অসুস্থ প্রবালকে দেখতে যাবার মুহূর্তে বাধাদানরত বিভুর উদ্দেশে তার উচ্চারণ--'... আমি তোদের এই পার্টির নির্দেশকে অত্যন্ত ছোট মনের পরিচয় বলে মনে করি। এই গোঁড়ামী আর সংকীর্ণ চিন্তাটা আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।'[৪৪] মা-এর এই স্বতন্ত্র সত্তা ইতঃপূর্বে বিভুর কাছে অস্পষ্ট ছিলো। প্রকৃতপক্ষে মা-এর প্রেরণা এবং উদ্দীপনায় প্রবাল এবং তার সহযোগীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ব্যাপক রূপ লাভ করে। শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সাথে কৃষকেরও ঐক্য সাধিত হয়। এবং শ্রেণীচরিত্রের অভিন্নতার কারণেই মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জামান মিয়া এবং মিল ম্যানেজার কংগ্রেসী জনার্দন চৌধুরী শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ঐকমত্যে উপনীত হয়। সাম্প্রদায়িকতার আবেগ ব্যবহার করে শ্রমিকদের শ্রেণী-ঐক্য বিনাশের চেষ্টাও কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সমন্বিত প্রয়াসে রূপ লাভ করে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্রের অন্তঃসারশূন্য ও জনবিরোধী স্বরূপ উপন্যাসের সতের পরিচ্ছেদে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন সত্যেন সেন। জনসাধারণের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন কংগ্রেস কর্মকর্তারা চৌধুরী কটন মিলের শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ধর্মঘটকে নীতিগতভাবে সমর্থন করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন, কংগ্রেসের আঞ্চলিক কর্মকর্তারা তা গভীরভাবে বিবেচনায় থাকে অক্ষম। প্রগতির পরিবর্তে অন্তর্গতিই হয় তাদের আদর্শের উৎস। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠন এমন ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, তাদের ধর্মঘটের সাফল্য-সম্ভাবনায় প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

এই বহির্জাগতিক ঘটনাধারার মধ্যেই বিভুর অন্তর্গত রক্তক্ষরণ প্রবল হতে থাকে। আর মা, বীথি?——

> একদিকে বিভু আর একদিকে প্রবাল, দু'জনের মাঝখানে একটি রক্তাক্ত মাতৃহৃদয়।

> তার মত বীথিও কঠিন সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে তার পার্টি, আর একদিকে প্রবাল। একটিকে গ্রহণ করতে গেলে অপরটিকে বিসর্জন দিতে হবে।...ফলে তার ভিতরকার দ্বন্দ্ব আর সংঘাত দিন দিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। অবশেষে এই ঘটল তার পরিণতি। তাদের বীথি আজ পাগল হয়ে যেতে বসেছে।[৪৫]

কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তঃসারশূন্যতা, সন্ত্রাসবাদের বিনাশী তৎপরতা, অগণতান্ত্রিক পার্টিনীতি--জাতীয় রাজনীতিতে যে-বিকৃতির জন্ম দিয়েছিলো—প্রতিটি চরিত্রের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পেছনে তা ক্রিয়াশীল। কিন্তু শ্রমিকদের ধর্মঘট, তাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন এবং পরিণামে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাথে সমন্বিত মিছিলের ঐক্যবদ্ধ প্রকাশে উপন্যাসের ঘটনাধারায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো।

কারখানার শ্রমিকদের সভায় মালিকপক্ষের গুণ্ডাদের আক্রমণ, পুলিশের সহায়তায় সেই আক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করলে বক্তৃতা-দানরত প্রবাল মর্মান্তিকভাবে আহত হয়; মাথা ফেটে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। প্রবালের পবিত্র রক্ত কংগ্রেসের সংস্কার ও নীতির অচলায়তনের ব্যূহ কে ভাসিয়ে দেয় অলক্ষ্যে। সভায় উপস্থিত জনতা পুলিশী প্রহরার মধেও সংঘবদ্ধ মিছিল নিয়ে হাসপাতালের দিকে যাত্রা করে: শ্রেণীসংগ্রাম যাদের জীবনমন্ত্র---লাল পতাকা যাদের রক্তিম সংগ্রামের প্রতীক। এই মিছিল কেবল বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকেই ঐক্যবদ্ধ করেনি, আন্দোলনের প্রবাহ বীথির রক্তাক্ত, দ্বন্দ্বক্ষত হৃদয়েও বহন করে এনেছে শুশ্রূষার ইঙ্গিত। 'মিছিলের অগ্রবর্তী মাতৃমূর্তি অপূর্ব এক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে' উজ্জীবিত করেছে সিবেন রায়, সুলতাকে। যে-মিছিলের প্রাণ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ সিবেন রায় বিভুর উদ্দেশে উচ্চারণ করেছে: 'একবার দেখ এই মিছিলের দিকে, আমাদের একূল ভেঙ্গে যাচ্ছে, ধ্বসে পড়ছে, আর তার পরিবর্তে ওপারে জেগে উঠছে নূতন কূল, নতুন সম্ভাবনা, নতুন ভবিষ্যৎ।' মিছিলের মধ্যে বীথি আদর্শের মীমাংসিত সত্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ করে অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু বিভু? 'পাথরের

মূর্তি যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।... সে কি ভাবছিল সেই জানে।' বিভুর এই সিদ্ধান্তহীন টানাপোড়েন কি বাংলাদেশের দ্বন্দ্ব-জটিল, দ্বিধা-বিভক্ত প্রগতিশীল, রাজনীতিপ্রবাহের পরবর্তী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত?

"মা" উপন্যাসের পরিণামী অংশের সাথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিহ্ন" (১৯৪৬) উপন্যাসের সাদৃশ্যের প্রশ্ন স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু "চিহ্ন" উপন্যাসের সংহত আয়তনে যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা, এ-উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। তবুও সত্যেন সেনের পরিণত জীবনবোধ ও রাজনৈতিক প্রেরণানিয়ন্ত্রিত শিল্পাদর্শ এ-উপন্যাসে দ্বন্দ্বময়চরিত্রপুঞ্জ ও তাদের উত্তরণের ইতিবাচক পথনির্দেশের ক্ষেত্রে যে অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় তা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

পাঁচ

বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শলব্ধ জীবনবীক্ষা সত্যেন সেনের শিল্পাবেগের মৌল প্রেরণা হলেও ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোড়নের পট-ভূমিতে কোনো উপন্যাস রচনা করেননি তিনি। এর কার্যকারণ সম্ভবত নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের চারিত্রবৈশিষ্ট্যের মধ্যে। সমাজ-জীবন-বাস্তবতার অনিবার্যতাই নির্ধা-রিত করে দেয় ঔপন্যাসিকের বিষয় নির্বাচনের উৎস ও সূত্রসমূহ। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসচেতন শিল্পীর দায়িত্বময় জীবন-অভীপ্সা কল্পনার পরিবর্তে জীবনের বস্তুময় স্বরূপকেই শিল্পের উপাদান হিসেবে মনে করেছে যথার্থ। যে-কারণে তাঁর উপন্যাসে রাজনীতি জীবন-অবলোকনের অনিবার্যতা সূত্রেই বিন্যস্ত। আলোচিত তিনটি উপন্যাসে শিল্পগত সাফল্যের সূত্র আমরা সন্ধান করিনি বটে, কিন্তু ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হয়ে-ওঠার ক্ষেত্রে "সাত নম্বর ওয়ার্ড" কিছুটা সংশয় সূচক হলেও, "উত্তরণ" এবং "মা" নিঃসন্দেহে সাফল্যস্পর্শী। "উত্তরণ"এর বিপুলায়তন পটভূমির মধ্যে যে অসংখ্য চরিত্রের বিন্যাস ঘটেছে, সমাজ পরিসরের সাথে তার সাধর্ম্য সন্দেহাতীত। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একজন জীবিকাসন্ধানী তরুণ জীবনের পথ-পরিক্রমায় বহির্জাগতিক বিচিত্র সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কিভাবে একজন পরিণত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হলো, তার বহির্গত ও অন্তর্গত কার্যকারণপরম্পরা উন্মোচনের

অনিবার্যতাসূত্রেই "উত্তরণ"-এর কাহিনীর এতো বিস্তারধর্মিতা ও জটিলতা। অন্যদিকে "মা" উপন্যাসে লেখক যেন ভারতীয় রাজনীতিপ্রবাহের সমগ্রতাকেই স্পর্শ করেছেন নির্মোহ, অনাসক্ত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর আত্ম-জৈবনিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের স্পন্দন-কম্পন এর অন্তরালে প্রবহমান থাকলেও, মা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকথা থেকে সমষ্টিগত জীবনকথায়, আঞ্চলিকতা থেকে ভারতীয় রাজনীতির সমগ্রতায় প্রসারিত জীবনবোধের শিল্পরূপ।

তথ্যনির্দেশ

১. 'শৈশব থেকেই তিনি [সত্যেন সেন] সংস্পর্শে এসেছিলেন মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের। যৌবনের প্রারম্ভেই সেই সময়কার অগ্নিযুগের বিপ্লবী দল 'যুগান্তর'-এর একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিরিশের দশকের শুরুতে কলেজের ছাত্র। আত্মগোপন করে থাকলেন বছর খানেক। তারপর ধরা পড়লেন। প্রথমে একটা ষড়যন্ত্র মামলায় জেল হাজতে কাটাবার পরে বিনাবিচারে আটক হয়ে রাজনৈতিক বন্দীনিবাসে কাটালেন '৩৭ সাল পর্যন্ত। অন্তরীণ থাকলেন বগুড়ার এক গ্রামে। '৩৮ সালে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে নতুন বিপ্লবী রাজনীতি মাথায় নিয়ে কমিউনিস্ট হয়ে। কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন হলো তাঁর সারা সময়ের কাজ।...

তিরিশের দশকে জেলে থাকার সময় তদানীন্তন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সহযোগিতায় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ রূপ তথা মজুর কৃষক প্রমুখ মেহনতী জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির হদিস খুঁজে পান মার্কসবাদ—লেনিনবাদে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে এই ধারাটা কর্মক্ষেত্রে সংগঠনে ও আন্দোলনে শরিক হবার মধ্য দিয়ে সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ধারা অন্তঃশীল হয়ে যায়।...

পাকিস্তানের শাসনামলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময়ে, সত্যেন সেন তিনবার দীর্ঘকাল জেলে কাটান। প্রথমবার

প্রধানত ঢাকা জেলে ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে। দ্বিতীয়বার প্রধানত রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে ও ঢাকা জেলে এবং তৃতীয়বার ঢাকা জেলে। এই দফায় দফায় জেলে থাকার এবং বেরিয়ে এসে প্রধানত সারা বাংলাদেশে গ্রামে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করার মধ্যেই তিনি একটার পর একটা বই লিখতে শুরু করেন।'----রণেশ দাশগুপ্ত, ভূমিকা, সত্যেন সেন রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), কার্তিক ১৩৯৩, ঢাকা

২. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি (অনুবাদ রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৯৮২, পপুলার লাইব্রেরী, কলিকতা, পৃ. ২৯২

৩. রণেশ দাশগুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্কার ১৯৭৩, জাগৃতি মুদ্রায়ণ, ঢাকা, পৃ. ২০৫

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

৫. প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৩, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা

৬. প্র. প্র. বৈশাখ, ১৩৭৪, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা

৭. এ-প্রসঙ্গে অজয় রায়-এর স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা উল্লেখযোগ্য: 'সময়টা ছিল ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মকাল। বছরখানেক সাজা খেটে নিরাপত্তা বন্দীদের ওয়ার্ডে ফিরে এসেছি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পুরোনো বিশ সেল। পাশাপাশি বিশটি ছোট ছোট কুঠুরী। সামনে দেয়াল ঘেরা এক চিলতে ওঠোন। সেটাকেই পাঁচটি খোপে ভাগ করা হয়েছে। তারই একটি খোপে সত্যেনদা ও শহীদুল্লা কায়সারের সাথে আমারও আবাস নির্দিষ্ট হলো। ...সত্যেনদা লিখছিলেন। শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক সেখানেই রচিত হয়েছিল এবং তার প্রথম পাঠক ছিলাম আমরা দু'জন। সত্যেন দা বেশ ক'টি বই লিখে ফেলেছেন। তাঁর 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' এবং 'অভিশপ্ত নগরী' লেখা শেষ হয়েছে। অন্য লেখায় হাত দিয়েছেন। তারপর বেশ কয়েক বছর এক সাথে ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত।'—'সত্যেন সেন—এক অনন্য ব্যক্তিত্ব', গণসাহিত্য,

(সম্পাদক আবুল হাসনাত), অষ্টম বর্ষ।। চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা।। চৈত্র ১৩৮৬, ঢাকা, পৃ. ৯

৮ দ্রষ্টব্য কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নজরুল আলম-কৃত জীবনকথা, সত্যেন সেন রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪-১৬

৯ উপন্যাসগুলি যথাক্রমে : 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৩৬৬); 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৩৭৩); অভিশপ্ত নগরী' (১৩৭৪); 'সেয়ানা' (১৩৭৫); 'পদচিহ্ন' (১৩৭৫); 'আলবেরুণী' (১৩৭৬), 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯); 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' (১৩৭৬); 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৩৭৬); 'অপরাজেয়' (১৩৭৭); 'উত্তরণ' (১৯৭০); 'মা' (১৩৭৭); এ কূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' (১৯৭১) এবং কুমারজীব (১৩৭৬)।

১০ রণেশ দাশগুপ্ত, 'বিপ্লবী নয়া ধ্রুপদী গণ-কথাশিল্পী সত্যেন সেন,' আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, প্র.প্র. ডিসেম্বর ১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৯২

১১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস', উত্তর প্রসঙ্গ, শ্রাবণ ১৩৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃ. ১৪৫

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

১৩ প্র. প্র. ১৩৭৬, সাহিত্য বুক ডিপো, চর কতুব, ঢাকা

১৪ প্র. প্র. ১৯৭০, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা

১৫ প্র. প্র. ১৩৭৭, স্বদেশ প্রকাশনী, ঢাকা

১৬ রণেশ দাশগুপ্ত, ভূমিকা, সত্যেন সেন রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. (এগারো)

১৭ সাত নম্বর ওয়ার্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

২২ র‍্যাল্‌ফ ফকস, নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপল, (অনু. সর্বজিৎ সেন/ সিদ্ধার্থ ঘোষ), প্র. প্র. ১৯৮০ পুপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ. ৮৮

২৩ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

২৪ উত্তরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯-৫০

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯

৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬০-৬১

৩৫ "মা" উপন্যাসের সূচনায় সত্যেন সেনকৃত ভূমিকাংশটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> 'দৃষ্টিহীনের এই প্রথম নিবেদন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। লেখা আমার পেশা, আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র পথ। কিন্তু সেইটাই একমাত্র কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা লেখার মধ্য দিয়ে আমি জনসাধারণের জবিনচিত্র সবার সামনে তুলে ধরতে এবং তাদের সংগ্রাম-সঙ্কুল অগ্রগতির পথে শরিক হতে চেষ্টা করি। দৃষ্টিশক্তি হারাবার ফলে সেই পথে এক দুর্লংঘ্য বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তাহলেও সেই বাঁধাকে ঠেলে ঠেলে পথ করে নিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। থামবার কথা আমি ভাবতে পারি না। আমি আপনাদের কাছ থেকে আমার জন্য সহৃদয় সহানুভূতি আর শুভেচ্ছা কামনা করি।'

৩৬ মা, পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-দুই, পৃ. ১৮

৩৭ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-এক, পৃ. ৬-৭

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৪০ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৭

৪১ মা, পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-ছয়, পৃ. ৫৪

৪২ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-দশ, পৃ. ৮০

৪৩ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-এগার, পৃ. ৯১

৪৪ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-বার, পৃ. ৯৬

৪৫ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-আঠার পৃ. ১৪০-৪১